বাতিঘরের বিভীষিকা - অজেয় রায়
Batigharer Bibhishika by Ajeo Ray

জায়গাটা দেখে দু'জনেরই খুব পছন্দ হয়ে গেল।

সমুদ্রতীরে দাঁড়ালে দেখা যায় উত্তর-পূর্ব-উত্তর-দক্ষিণে অর্ধবৃত্তাকারে অকুল পাথার জলরাশি। বঙ্গোপসাগরের ঢেউগুলি অশ্রান্তভাবে এসে আছড়ে পড়েছে বেলাভূমিতে। সাগরের দিকে মুখোমুখি হলে পিছনে কিছুদূরে নাতিউচ্চ পর্বতশ্রেণি, উত্তর-দক্ষিণে সাগরের তটরেখা বরাবর প্রাচীরের মতো চলে গিয়েছে। নির্জন সমুদ্র সৈকত। বেলাভূমির সাদা ও ঈষৎ কালচে বালুরাশি পেরিয়ে কোথাও রক্তবর্ণ উচুনিচু খোয়াই আর শিলাময় কঠিন জমি। মাঝে মাঝে ঝাউ আর কেয়া বন। সেখানে মানুষের বসতি বলতে মাত্র একটি ছোট্ট জেলে পল্লি।

জায়গাটি ভারতের দক্ষিণ উপকূলে ভিজেগাপত্তম থেকে কিছুটা উত্তর পূর্বে। প্রায় চারশো বছর আগে এখানে অন্ধ রাজাদের এক বন্দর ছিল। সমুদ্র উপকূলে, পাহাড়ের গায়ে সেই প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে অনেক ছোট বড় অট্টালিকা, মন্দির ও প্রকারের চিহ্ন।

আগাছা ও জঙ্গল গজিয়েছে ইট পাথরের ঢিবি আর ভাঙাচোরা খণ্ড খণ্ড দেয়ালের গায়ে। সব চেয়ে কাছের লোকালয়টি অন্তত মাইল দুই দূরে। তাকে বড় জোর আধা শহর বলা যায়, নাম বিমলী। একটা কাঁচা রাস্তা বিমূলী থেকে এঁকে

বেঁকে এসে পৌঁছেচে ভাঙা বন্দরের কাছে। শহরের লোক এই সমুদ্রতীরে পা দেয় কদাচিৎ। তবে এখানকার জেলেরা প্রায়ই শহরে মাছ বিক্রি করতে যায়, হাট বাজার করতে যায়। অজয় আর সুনীল বিমলীতে বেড়াতে এসেছে তিন দিন হল।

প্রত্যেকদিন দুই বন্ধু হাজির হয় ভাঙা বন্দরের তীরে। ঘুরে ঘুরে দেখে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি। পাহাড়ে ওঠে, সমুদ্রে স্নান করে, ঝিনুক কুড়োয়। সাধারণত আসে সকালে, দুপুরে ফেরে। একদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে এসে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছে।

শহরের কেউ কেউ বারণ করেছে তাদের—"মশাই যাবেন না ওদিকে, ভাঙা বাড়িগুলো সাপখোপের আড্ডা। ফিরতে রাত হলে পথ হারাবেন। তাছাড়া, জায়গাটা ভালো নয়। কেন, কাছেই তো ভালো বিচ আছে।

জায়গাটা কেন ভালো নয়, মানে ভূত প্রেতের ভয়ের কথা পরিষ্কার করে না বললেও তারা ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে। শুনে দুই বন্ধুর জায়গাটার ওপর টান বেড়েছে বই কমেনি।

তাদের কাছে জায়গাটির আর এক আকর্ষণ হল এক প্রাচীন লাইট হাউস। পুরনো বন্দর এলাকার সামনে তীর থেকে মাইল দেড় দূরে সমুদ্রের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে লাইটহাউসটা। গোল গম্বুজের মতো গড়ন। প্রতিদিন অজয়া খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখত এটাকে। জলের মধ্যে ছোট্ট এক নেড়া পাথুরে দ্বীপ। তার ওপর তৈরি হয়েছে লাইট হাউস। এখন অবশ্য ওই আলোক-স্তম্ভের মাথায় আলোর ইশারা নাবিকদের সংকেত জানায় না, সাবধান করে দেয় না। বন্দরটি পরিত্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই আলোকস্তম্ভের কাজও ফুরিয়েছে। কিন্তু তার দৃঢ় পাথুরে দেহ সমুদ্র-তরঙ্গের অবিরাম আঘাত সহ্য করে আজও খাড়া রয়েছে। কেবল ওই পাথুরে দ্বীপ নয়, ওর কাছে নাকি একটা ডুৰৰ পাহাড় আছে, তাই তৈরি হয়েছিল লাইটহাউসটা। 'বাঃ চমৎকার কড়িটা।" অজয় সমুদ্রতীরে বালির ওপর থেকে একটা কড়ি কুড়িয়ে নিল। 'দেখি?' সুনীল সেটা হাতে নিয়ে দেখতে থাকে।

প্রায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা। হালকা চকচকে হলুদ গায়ে কালো আর খয়েরি ফুটফুট। মুগ্ধ হয়ে দেখে।

কড়িটা একবার দেখতে পারি?' গম্ভীর গলায় ইংরেজিতে কথাগুলো কানে যেতে দু'জনে ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠল। পিছনে দাঁড়িয়ে মিস্টার ভেঙ্কটেশ্বর রাও।

অজয়রা ভদ্রলোককে দেখেছে। কিছুটা পরিচয়ও জেনেছে। প্রৌঢ়, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায় মজবুত শরীর, ধারালো মুখের গড়ন, তীক্ষ্ণ চোখ। মাথায় কঁচা পা চুল। চিবুকে অল্প দাড়ি।

অজয়রা এসে পর্যন্ত প্রত্যেকদিন এই ভদ্রলোককে দেখেছে সমুদ্রের ধারে একা একা ঘুরছেন। কখনও সামুদ্রিক জীবের খোলা তুলে পরীক্ষা করছেন। কখনও বা পাথরের ওপর বসে চুপচাপ তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে আর চরট টানছেন। তার পরনে থাকে শার্ট ও ফুল প্যান্ট এবং রোদুরের সময় মাথায় কাপ।

বিমলীর বাসিন্দাদের মধ্যে মাত্র এই একটি লোক প্রায় নিয়মিত প্রাচীন বন্দরের কাছে সমুদ্রতটে আসেন। শহরের অন্য লোকেরা যে সমুদ্র সৈকতে যায় সেখানে তিনি যান না।' ভদ্রলোকের চালচলন রহস্যময়।

বিমলীর প্রান্তসীমায় একটি ছোট বাড়িতে মিস্টার রাওয়ের বাস। একা থাকেন। একটি পরিচারক তার কাজকর্ম করে দেয়। পাঁচ বছর হল এসেছেন এখানে। চাকরি কিংবা ব্যবসা কিছুই করেন না। ঘরে থাকেন বা একা বেড়িয়ে সময় কাটান। ও প্রথম বিমলীতে এসেছিলেন দিন পনেরোর জন্য। জায়গাটা পছন্দ হয়ে যাওয়ায় মাস ছয় পরে এসে বাড়ি কিনে পাকাপাকিভাবে রয়েছেন।

শহরের লোক রাওয়ের ব্যক্তিগত জীবনের খবর সামান্যই জানে। আগে নাকি উনি জাহাজে কাজ করতেন। লোকটি অহংকারী ধরনের। এই শহরের লোকদের সঙ্গে মেশেন না মোটে। তবে ভদ্রলোক বোধ হয় বেশ শিক্ষিত। কারণ বিমলীর যে দু-চার জনের ওঁর ড্রইংরুমে উকি দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তারা দেখেছে, ঘর ভর্তি নানা বিষয়ের বই। শহরের লোক ওকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু সমুদ্রতীরে জেলেদের সঙ্গে মিস্টার রাওয়ের দিব্যি খাতির আছে। গরিব জেলেদের তিনি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন বলে শোনা যায়।

মাঝে মাঝে রাও বিমলী ছেড়ে ডুব মারেন কয়েক দিনের জন্য। রাওয়ের পুরনো পরিচিত কোনো অতিথি এখানে এসেছে কদাচিৎ। শহরের কারও সঙ্গে

তাদের আলাপ করিয়ে দিতে রাও আগ্রহ বোধ করেননি। নানা গুজব আহে রাও সম্বন্ধে। সেগুলি মানুষটির বিষয়ে সন্দেহই জাগায়।

“কি, দেখাবেন?' দু'জনকে হা করে চেয়ে থাকতে দেখে রাও অধৈর্য হয়ে বললেন।

‘হা, এই যে,' থতমত খেয়ে অজয় কড়িটা মিস্টার রাওয়ের হাতে তুলে দিল। রাও কড়িটা একবার ঘুরিয়ে দেখে মাথা নাড়লেন, তারপর অজয়ের হাতে সেটি ফিরিয়ে দিলেন।

‘কি, কড়িটা ভালো?' অজয় জিজ্ঞেস করল।

‘ভালো তবে রেয়ার নয়। আমি ভেবেছিলাম অন্য এক রকম।'

‘এ কড়ির নাম জানেন?

“জানি। সাইপ্রেইয়া টাইগ্রিস লিনে। সোজা কথায় ব্যাঘ্র-কড়ি। বাঘছালের মতো গায়ের রং কিনা।'

অজয়রা বুঝল, ভদ্রলোক সামুদ্রিক জীব-জন্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট জানেন। নইলে টপ এর বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম বলে দেন কী করে? এই অদ্ভুত রহস্যময় লোকটিকে তার কৌতূহলী চোখে দূর থেকে দেখেছে। কাছে পেয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল।

কথাবার্তা ইংরিজিতেই হচ্ছিল।

অজয় বলল, 'আপনি প্রত্যেক দিন এখানে বেড়াতে আসেন দেখেছি।” ‘হু।”

'আপনি বিমলীতে থাকেন?', রাও এবার শুধু সামান্য মাথা ঝাকিয়ে হাঁ জানালেন।

“আপনারা কোত্থেকে? বাঙালি মনে হচ্ছে?' এবার পাল্টা প্রশ্ন করলেন রাও।

‘হ্যা, বাঙালি। আমি কলকাতায় থাকি ও হায়দরাবাদে। আমি অজয় দাস ও সুনীল রায়।'

এখানে কেন ?

এমনি বেড়াতে এসেছি।'

‘এখানে তো কোনো টুরিস্ট আসে না। পাণ্ডব বর্জিত জায়গা।'

‘সুনীলের এক অন্ধ্রদেশি সহকর্মীর একটা বাড়ি আছে এখানে। তার কথাতেই এসেছি। ওর বাড়িতেই উঠেছি। বাড়িটা প্রায় খালি। কেবল এক বৃদ্ধা থাকে। খাসা আছি,' জানাল অজয়।

‘এই সি-বিচে কেন? শহরের কাছে তো আরও ভালো বিচ রয়েছে। অজয়দের উপস্থিতি যেন ভদ্রলোকের পছন্দ নয়!

“কেন, আপনি যে আসেন?”

অজয়ের কথায় একটু থমকে গেলেন রাও। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন - “আমার কথা আলাদা। আমি আসি সামুদ্রিক জীব-জন্তুর খোজে। সে দিক দিয়ে বিচটা চমৎকার। কত রকম প্রাণী ভেসে আসে। তাছাড়া লোকের ভিড় আমার সহ্য হয়।

আমাদের কিন্তু দারুণ লাগছে বিচটা। কত ঐতিহাসিক চিহ্ন এখানে। ‘আপনাদের ইতিহাসে আগ্রহ আছে?' ‘আছে। আমি ইতিহাস পড়াই কলেজে, ও অবশ্য ইঞ্জিনিয়ার।' জানাল অজয়। ‘বন্দুক এনেছেন কেন?” সুনীলের কাধে ভোলানো শটু-গানটার দিকে দেখালেন রাও। “ভেবেছিলাম শিকার টিকার যদি মেলে। এই পাখি টাখি।' সুনীল উত্তর দিল। এখানকার শান্তি নষ্ট করবেন?" রাও যেন বিরক্ত।

না, না, তাই গুলি ছুড়তে ইচ্ছে করেনি। ছুড়িওনি একটাও। এমনি সঙ্গে রেখেছি', বলল সুনীল। রাও বললেন, 'ওই ধ্বংসপগুলোয় ঢুকতে গেলে অবশ্য বন্দুকটা কাজে লাগবে। বিষাক্ত সাপ আছে ওখানে আর হিংস্র শেয়াল। শ্মশানের মড়া খেয়ে খেয়ে শেয়ালগুলো মাংসাশী হয়ে উঠেছে। সাবধানে যাবেন।

“আপনার সামুদ্রিক জীবের কালেকশন্ আছে?” অজয় জিয়েস করল। “হু।”

"আমরা যদি একদিন দেখতে যাই?" মিস্টার রায়ের কপালে ক'টি ভাজ পড়ল। উত্তর দিলেন না। বোঝা গেল তাদের বাড়িতে আহ্বান করতে রাওয়ের অনিচ্ছা। বেশি মাখামাখি করতে চান না।

অজয় তবু হাল ছাড়ে না, 'ভাব আমাবার চেষ্টা করে। "আচ্ছা এই লাইট হাউসটায় যাওয়া যায়?' অজয়া আঙুল দেখায়।

ভেঙ্কট রাও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন লাইট-হাউসটা। শহতের পরিষ্কার সকাল। তেজি রোদে ঝকঝক করছে আলোক-স্তম্ভের কালচে পাথুরে দেহ। পটভূমিকায় দিগন্ত ছোঁয়া ঘন নীল জল। 'ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে। 'কেন? ওখানে কেন ? জানতে চাইলেন রাও।

এমনি, দেখতে যেতে চাই। লাইট হাউসের মাথা থেকে সমুদ্র দেখতে নিশ্চয়ই দারুণ লাগবে। ওর সিড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা যায় ? জানেন?

'হু, যায়।'

"ওই রক্টায় পৌছানো যায় না?'

"যায়, তবে রিস্কি।

রাওয়ের সাবধানবাণী অজয় গ্রাহ্য করল না। মহা উৎসাহে বলল-"জেলেদের বললে রাজি হবে না নিয়ে যেতে ?" বলা শক্ত। তবে আমার পরামর্শ যদি চান বলব, শখের অ্যাডভেঞ্চার করতে এতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। এখানকার ডুবো পাথরে করাতের মতো ধার, নৌকো বেকায়দা আছড়ে পড়লে ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে।' 'আমরা সাতার জানি।" অজয় জোরালো কণ্ঠে জানায়।

ও সুইমিংপুলের বিদ্যে কোনো কাজে দেবে না। ভেঙ্কট রাওয়ের ঠোটে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে।

'আমরা ভয় পাই না' গরম হয়ে বলল অজয়।।

'অল রাইট। উইশ ইউ গুড লাক।' মিস্টার রাও হঠাৎ ফিরে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন। বোধ হল মনে মনে বেশ চটেছেন।

অজয় ও সুনীল দুজনেই শক্ত সমর্থ যুবক, ডানপিটে বেপরোয়া। রাওয়ের বিপ তাদের জেদ চেপে গেল। যেতেই হবে ওই লাইট-হাউসে। বিপদজনক হলেও পরোয়া নেই। জেলে পল্লিতে গিয়ে তারা লাইট-হাউসে পৌছনোর কী ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা করতে লাগল।

কয়েকজন জেলে স্রেফ না করে দিল। বিদেশি লোক জলে ডুবে মরলে তাদের হাতে হাতকড়া পড়বে। জেলেদের কথা ঠিক বোঝা যায় না। হাত মুখ নেড়ে ইশারায় যদুর সম্ভব বোঝাবুঝি চলে। শেষে এক বৃদ্ধ মাতব্বর জেলেকে ধরল 'অজয়রা। সুনীল অবশ্য কিছু তেলেগু শিখেছিল। সেই কথাবার্তা চালাচ্ছিল। সুবিধে হল বুড়ো জেলে খানিক হিন্দি ও ইংরেজি জানে। সে অনেক দিন কাজ করেছে ভিজেপত্তম বন্দরে। তাই শিখেছে। বুড়োকে অনেক খোশামোদ করতে সে কয়েকজন জেলেকে রাজি করাল, অবশ্য মোটা বকশিশ কবুল করে।

জেলেরা বলল যে আসচে কাল সমুদ্র যদি শান্ত থাকে তো তাদের লাইট-হাউস দেখিয়ে আনবে।

সকালে যখন তারা মাছ ধরতে বেরবে তখন তাদের নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে যাবে। নামিয়ে দেবে লাইট-হাউসের তলায়। তারপর তারা পাড়ি দেবে খোলা সমুদ্রে। আবার সাত-আট ঘণ্টা পরে মাছ ধরে তীরে ফেরার সময় তুলে আনবে।

জেলেদের কাছে একটা খবর জেনে খুব অবাক হল অজয়রা। ভেঙ্কট রাও নাকি যান ওই লাইটহাউসে। এমনকী কখনও কখনও রাতেও থাকেন। কথাটা বেমালম চেপে গেলেন কেন ভদ্রলোক? আশ্চর্য!

‘বেশ আমরাও রাত কাটাব ওখানে প্রস্তাব দিল সুনীলরা তারপর ভেঙ্কট রাওতে শুনিয়ে দেব শখের অ্যাডভেঞ্চারের দৌড় কত।

বুড়ো জেলে শুনেই আঁতকে উঠল। উরি ব্বাপ। কাল আবার পূর্ণিমা। ‘কেন পূর্ণিমায় আপত্তির কী?

বুড়ো চোখ বড় বড় করে বলল, এই সব পূর্ণিমা রাতে লাইট-হাউসটা দানোয় পায়। বাতাসে চিৎকার ভেসে আসে ওদিক থেকে। অনেক জাহাজ নৌকো ডুবেছে ওখানে, অনেক লোক মরেছে তাদের প্রেতাত্মারা পূর্ণিমা রাতে জড়ো হয়ে কাঁদে, আর্তনাদ করে। “কিন্তু মিস্টার রাও যে যায়?

বুড়ো হাত নেড়ে মুখ ভঙ্গি করল। বোভালো, পাগল লোকটা যা করে অন্য পাঁচজন সুস্থ মানুষের কি তা সাজে? ঠিক মরবে একদিন। , পূর্ণিমা রাতে ভূতুড়ে আওয়াজ অজয়দের মনে বেশ দাগ কাটল। খটকা লাগল, কী করতে রাও যায় ওখানে? লোকটা কি সত্যি ক্ষেপাটে না আর কিছু? যাহোক লাইট-হাউসে রাত কাটানোর প্ল্যানটা আপাতত বাদ দিল আমার থাকা যাবে কিনা বুঝে নিয়ে পরে বরং একরার রাত কাটিয়ে আসব ওখানে।

পরদিন ভোরে জেলে পল্লিতে হাজির হল অজয় ও সুনীল। দুটো নৌকো সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। তার একটায় উঠল অজয়রা।

শান্ত সমুদ্র। অনুকুল বাতাস। তরতর করে এগিয়ে চলল নৌকো। আকাশ সামান্য মেঘলা। তাতে দিব্যি আরামই লাগছিল। একটা নৌকো এগুল উত্তর-পুবে আর অজয়দের নৌকো একটু ডাইনে বাঁক নিয়ে সোজা লাইট-হাউস লক্ষ্য করে চলল।

লাইট-হাউসের কাছে পৌঁছে খুব সাবধানে নৌকো চালাচ্ছিল মাঝিরা। ওরা জানে কোথায় কী বিপদ। লাইট-হাউসের দক্ষিণে অল্প দূরে একটা ডুবো পাহাড়ের চুড়ো দেখা গেল। তখনও প্রায় ফুট দুই জলের ওপর জেগে রয়েছে। পুরো জোয়ারের সময় ডুবে যায়।

যে শিলাস্তুপের ওপর লাইট-হাউসটা তৈরি হয়েছে মাঝিরা তার গায়ে নৌকো ভেড়াল। একটা খাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল নৌকো। খাজের গায়ে পাথর সিঁড়ির মতো ধাপ করে কাটা। তাই নামতে অসুবিধা হল না। অজয়দের নামিয়ে দিয়ে নৌকো আবার রওনা হল তার সঙ্গী তরীটি লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় নৌকোটিকে তখন দূর সাগরের বুকে বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে।

ধীরে ধীরে দ্বীপের ওপরে উঠল অজয় ও সুনীল। তীর থেকে এটা যত ছোট দেখায় আসলে তার চেয়ে ঢের বড়। জলের ওপর বেশ খানিকটা মাথা তুলে রয়েছে। পাথর কেটে সমান করা হয়েছে ওপরের খানিকটা জায়গা। ঘাড় বাঁকিয়ে মুখ উঁচু করে দেখল তারা। অন্তত ষাট-সত্তর ফুট খাড়াই হবে স্তম্ভ। তলা থেকে ওপর দিকে একটু সরু হয়ে গিয়েছে। স্তম্ভের নিচের অংশে পাথুরে দেওয়ালে একটা বড় ফাটল দেখা গেল। কালের। নির্মম আঘাত সহ্য করে আর এটা কতদিন টিকে থাকবে কে জানে?

দ্বীপের পাথর কালচে ও মেটে রঙের। তাতে শ্যাওলার সবুজ ছোপ ছোপ শিলা খণ্ডের ফাকে জমা মাটিতে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মেছে। হঠাৎ মানুষের আগমনে কয়েকটা বড় বড় সামুদ্রিক পাখি ডানা মেলে আকাশে উড়ল। চক্রাকারে পাক খেতে লাগল মাথার উপর। তীক্ষ্ণ ভীত স্বরে ডেকে ডেকে জানাতে লাগল তাদের বিরক্তি। অজস্র সামুদ্রিক জীবের খোলা ও হাড় ছড়ানো রয়েছে দ্বীপে। দ্বীপের কিনারে লেগে ঢেউগুলি ছিটকে ছড়িয়ে। পড়ছে। শিলাপের গা বেয়ে অনেকখানি উঠে আসছে জল। আবার পিছিয়ে যাচ্ছে গড়িয়ে।

পিছল পাথরের গায়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে দু জনে লাইট হাউসের নিচে পৌছল। ওপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে দরজায় এখন কপাট নেই, হাঁ করে আছে। পাক খেয়ে সরু সিড়ি উঠে গিয়েছে। ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

ভিতরটা স্যাতস্যাতে আঁশটে গন্ধ কেমন। তবে সিড়িগুলো প্রায় অক্ষত আছে।

দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট চৌকো ঘুলঘুলি দিয়ে ক্ষীণ সূর্যের আলো ঢুকছিল ভিতরে, তাই উঠতে অসুবিধা হচ্ছিল না বিশেষ। তবে তারা টর্চও জ্বালছিল দরকার মতো। একটা কামরায় এসে হাজির হল তারা। এই ঘরে বোধ হয় থাকত লাইট-হাউসের রক্ষক। গোল ঘরটা মোটামুটি পরিষ্কার, যেন কেউ ঝাট দিয়েছে। এক কোণে কিছু জঞ্জাল জড়ো করা। ঘরের তিন দিকে তিনটে ছোট জানলা, এক সময় জানলায় পাল্লা ছিল নিশ্চয় কিন্তু এখন স্রেফ ফুটো। মিস্টার রাও এ ঘরে আসেন—এই যে প্রমাণ। অজয় মেঝেতে একটা চুরুটের টুকরো দেখাল।

এ ঘরের কোণ দিয়ে আবার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। ওপরে উঠল অজয়রা। মনে হয় এই বুঝি আলোক স্তম্ভের ছাদ। আসলে এটাই ছিল ঘরে দেওয়াল বলতে কিছু নেই। গোল মেঝের ধারে ধারে সমান দুরত্বে কতগুলো পাথরের থাম খাড়া হয়ে আছে—মোট আটটা থাম। থামের মাথায় আর ছাদ নেই এখন। এক সময় বাতি ঘরের চারপাশ ছিল কাচে ঘেরা। থামের গায়ে কাচ আটকানোর ফ্রেম বসাবার গর্ত দেখা গেল। তবে কাচ বা ফ্রেমের চিহ্ন নেই আজ। এই ঘরেই জ্বালা হত অগ্নিকুণ্ড কিংবা মোম বা তেলের উজ্জ্বল বাতি। সেই বাতি বন্দরে আসা যাওয়ার সময়। তরীকে হুঁশিয়ার করে দিত।

চারধার খোলা থাকার দরুন ঘরটার ভিতর দিয়ে যেন ঝড় বইছে। শক্ত করে থাম আঁকড়ে তবে দাঁড়াতে হয়। এই টংয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখা সত্যি এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। শুধু পশ্চিমে তটরেখা, বাকি তিন পাশে অসীম বারিধি।

দিকচক্রবাল ঢালু হয়ে উঠে গিয়েছে। আর সেই ঢাল বেয়ে যেন নেমে আসছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। যত কাছে আসে ঢেউগুলি স্পষ্ট হয়, উঁচু হয়, আর যেন তাদের গতি বাড়ে। জল ও বাতাসের কী অবিরাম গজনি! ফেনিল তরঙ্গগুলি নাচতে নাচতে ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ছে পায়ের নিয়ে শিলাস্তুপে। ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডটির ওপর বিপুল জলরাশির কি আক্রোশ! বাতাসের তোড়ে এক চেঁচিয়ে না বললে কথা শোনা যাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখল দু'জনে সাগরের এই চঞ্চল রূপ। মিস্টার রাওকে ধন্যবাদ। তার ঠাট্টার খোঁচা খেয়েই জেদ করে চলে এল নইলে আসা হত কিনা সন্দেহ।

সমুদ্রের বাতাসের গুণে এবং পরিশ্রমে বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। অজয়রা নেমে এল নিচের ঘরে। হ্যাভারস্যাক খুলল। স্যান্ডউইচ ও কফি খেল। তারপর মেঝেয় শতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়ল।

ঘন্টাখানেক জিরিয়ে অজয়রা আবার চড়ল বাতিঘরে। আরে একী, আকাশের একী পরিবর্তন!

আকাশে কালো করে মেঘ জমেছে। দিনের আলো ফ্যাকাসে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড় বৃষ্টি আসবে না কি?

ঝড় বৃষ্টি এল ঠিকই, তবে এমন কিছু নয়। অন্তত তীরে থাকলে তাই বলত অজয়রা। কিন্তু লাইট-হাউসের প্রহরীর ঘরে আশ্রয় নিয়ে তাদের মনে হল যেন প্রলয় শুরু হয়েছে। বাইরে জল ও বাতাসের কী শোঁ শোঁ গর্জন। থেকে থেকে বাজের কী হুংকার, আর চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের চমক। ছাদের সিঁড়ির ফাক দিয়ে এবং জানলার ফুটো দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট ঢুকে তাদের বেশ ভিজিয়ে দিল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে বৃষ্টি ধরে গেল। কিন্তু বাতাসের বেগ কমল না। একবার বাতিঘরে উঠতেই মনে হল বাতাস বুঝি ধাক্কা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেবে। ভয়ে নেমে এল তারা। সমুদ্রও উদ্দাম। এমন স্রোতে এই বিপদজনক এলাকায় কি আসবে তাদের নৌকো? অবশ্য এখনও সময় আছে।

বেলা চারটে বাজল। অজয়দের নৌকো কিন্তু এল না। যদিও ততক্ষণে সমুদ্র ফের শান্ত হয়ে এসেছে। ঝড় বৃষ্টির দাপটে ওই ডিঙি নৌকোকে যে কতদূরে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে কে জানে?

‘আজ বোধহয় এখানেই কাটাতে হবে,' বলল অজয়। ভাগ্যিস বেশি করে খাবার এনেছি সঙ্গে। কাল নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। ভাড়া পায়নি যখন আসবে ঠিকই।

প্রহরীকক্ষের জানলা দিয়ে সুনীল তীরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলে উঠল-দেখ, একটা নৌকো আসছে এদিকে। আরে মিস্টার রাও যে!'

নৌকোখানা তখন প্রায় লাইটহাউসের পায়ের কাছে পৌছেছে। তিনজন মাঝি নৌকো ৰাইছে। একজন ধরেছে হাল। রাও বসে আছেন পাটাতনে।

‘ভালোই হল, দেখা যাক রাও এখানে কী করেন। সম্ভবত উনি আজ রাত কাটাবেন এখানে। বলল অজয়। রাওয়ের নৌকো দ্বীপে ভিড়ল।

একটু পরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সিঁড়ি বেয়ে একজন উঠে আসছে। রাও যখন দরজায় এসে দাঁড়ালেন দু-বন্ধু তখন নির্বিকার ভাবে কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত থমকে থেকে রাও কথা বললেন—“আপনারা এসেছেন আমি শুনেছি।

একটু পরে পায়ের শব্দ শোনা গেল সিড়ি বেয়ে একজন উঠে আসছে। রাও যখন দরজায় এসে দাঁড়ালেন দু-বন্ধু তখন নির্বিকার ভাবে কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত থমকে থেকে রাও কথা বললেন—“আপনারা এসেছেন আমি শুনেছি।

আমার নৌকো এখুনি ফিরবে তাতে ফিরে যান। আপনাদের নৌকোর আজ আর আসার চান্স নেই। আশা করি যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে? রাওয়ের ঠোটে ব্যঙ্গের আভাস।

‘না। মাথা নাড়ল অজয়। 'মানে?'

‘মানে, আমরা আজ রাতটাও কাটাব এখানে। অ্যাডভেঞ্চারটা পুরোপুরি করতে চাই।' “আপনারা যাবেন না?' “আজ্ঞে না স্যর। দৃঢ়কণ্ঠে জানাল অজয়। সুনীলও মাথা নেড়ে সায় দিল।

রাগে রাওয়ের চোখ দুটো যেন ঝলসে উঠল। গভীর একটা দম নিয়ে কোনোরকমে সামলালেন নিজেকে। কঠিন চাপা কণ্ঠে বললেন—‘অলরাইট। এরপর তিনি বাতিঘরে উঠে গেলেন গটগট করে।

উকি মেরে দেখল অজয়রা, রাও হাত নেড়ে ইশারা করলেন তার নৌকোর মাঝিদের। একটু পরে দেখা গেল নৌকো ফিরে চলেছে তীরের দিকে।

রাও বাতিঘর থেকে নামলেন না। নিচের ঘরে অজয় ও সুনীলের মহা অস্বস্তি। মতলব কী লোকটার? স্মাগলার নয়তো? ওরা শুনেছে বঙ্গোপসাগরে কুলে চোরাচালানকারীদের লঞ্চ আসে। নির্জন তটে দলের লোকের কাছে নামিয়ে দেয় বহুমূল্য চোরাইমাল। রাও কি সেই দলের লোক? লাইট-হাউস থেকে সংকেত জানায় তাদের? সম্ভাবনাটা মনে এলেও মানতে ইচ্ছে হয় না। হাজার হোক লোকটা শিক্ষিত। খামখেয়ালি হলেও ভদ্রলোক বলে মনে হয়। যাহোক সতর্ক থাকতে হবে।

পশ্চিমে পর্বতমালার আড়ালে সূর্য অস্ত যেতে লাগল। সাগরের বুকে কি অপূর্ব রক্তিমছটা। ‘ওপরে আসতে পারেন। হঠাৎ রাওয়ের ডাক শুনে অজয়রা অবাক হল।

যা হোক ভূতের মতো আধো অন্ধকারে বসে থাকার চেয়ে ওপরে যাই। লোকটির কাছাকাছি থাকলে বরং বিপদটা আন্দাজ করতে সুবিধে হবে। দু’জনে গুটিগুটি ওপরে গেল। বাতিঘরের মেঝেতে বসে আছেন রাও। সুনীলকে দেখেই প্রশ্ন করলেন ‘বন্দুক এনেছেন নাকি?'

না। মাথা নাড়ল সুনীল।

‘ভালোই করেছেন। আনাড়ি লোক ঘাবড়ে গিয়ে গুলি চালালে উপকারের চেয়ে অপকারই হয় বেশি।

সুনীলের অবশ্য তখন খুব আপশোস হচ্ছে, কেন বন্দুকটা আজ আনলাম না?

ইয়ংমেন, সাহসের খুব বড়াই করছিলে। বেশ, দেখা যাক তোমাদের নার্ভ কেমন শক্ত। আশা করি তোমাদের অ্যাডভেঞ্চারের সাধ আজ মিটবে।' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন রাও।

‘কেন কী হবে?’ অজয়ের উদ্বেগ আর চাপা থাকে না। দেখতেই পাবে। অবশ্য যদি তোমাদের লাক থাকে।

রাও আর কথাবার্তা না বলে সমুদ্রের দিকে চোখ ফেরালেন। অগত্যা অজয় ও সুনীল বসে পড়ে সমুদ্র দেখতে।

পূর্ণিমার রাত। মস্ত গোল চাঁদ উঠছে সাগরের কোল থেকে। ঈষৎ লালচে চাঁদ ক্রমে রুপালী রং নিল। ওপরে ফুটফুটে আকাশ। নিচে বিপুল জলরাশি জোয়ারের ফাঁপছে, ছুটছে। যেন তরল রুপোর স্রোত বইছে। অপরূপ অপার্থিব সেই দুর্ভাবনার ভার না থাকলে তারা এই সৌন্দর্যকে আরও অনেক উপভোগ করত।

ছমছম করছে মন। কী হবে? তবে কি কোনো ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটতে চাল কথাই কি তবে ঠিক? রাও ঠায় তাকিয়ে আছেন বাইরে। হাতে জ্বলন্ত চুরুট। মানে অস্থিরভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছেন সমুদ্রের একধার থেকে আর এক ধার। কিন্তু তীরের দিকে একবারও চাইছেন না। রাত প্রায় বারোটা। জল ও বাতাসের তর্জন সমানে চলেছে। হঠাৎ রাও একটু ঝুকে পড়লেন। নিবিষ্ট চোখে দেখছেন কিছু। অজয়রাও দেখতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছু সাম করতে পারে না।

রাও চকিতে ফিরলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—সে আসছে। থামের আড়ালে যতটা পারেন লুকিয়ে বসুন। ওই দিকে লক্ষ করুন। তিনি পূর্ব-দক্ষিণে সাগরের বুকে আঙুল দেখালেন। কী আসছে?’ জিজ্ঞেস করল অজয়। রাও জবাব দিলেন না।

অজয়রা রাওয়ের নির্দেশ মতো যথাসম্ভব গা ঢাকা দিয়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। তাদের বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পিটছে। জানা বিপদ থেকে অজানা বিপদের সম্ভাবনাই বেশি ভয়ের ও রহস্যময়।

খানিকক্ষণ কিছুই তাদের নজরে এল না। তারপর আবছা দেখতে পেল। পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোক এবং জলে ফসফরাসের ঝিকিমিকিতে দেখল—সাগরের বুক চিরে কিছু একটা এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। খুব লম্বা। গাঢ় রঙ। গোল পিঠ। তীব্র বেগে জল কেটে এগোচ্ছে।

কী ওটা? কোনো জীবন্ত প্রাণী না টর্পেডো জাতীয় কোনো সামুদ্রিক যান? এখনও ওটা মনে হয় মাইল খানিক দূরে।

হু হু করে এগোতে এগোতে লাইট-হাউস থেকে শ'খানেক হাত দূরে এসে সেটা হঠাৎ থেমে গেল। তারপর জল থেকে উঁচু হতে লাগল এক বিপুল লম্বা দেহ। বার কয়েক বেঁকেচুরে মোচড় খেয়ে খাড়া হয়ে রইল। জল ছেড়ে অন্তত কুড়ি পঁচিশ হাত উঠেছে সে। রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগল অজয় ও সুনীল।

ওটা যে জীবন্ত প্রাণী সন্দেহ নেই। কারণ ওর মস্ত চেপ্টা মাথা দেখতে পাচ্ছে তারা। প্রকাণ্ড পিপের মতো গোল মোটা তার দেহ। অদ্ভুত অলৌকিক ওই জীবটা যেন সোজা। তাকিয়ে আছে এই লাইট-হাউসের দিকে।

'কী ওটা?' সুনীল কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল রাওকে।

কী মনে হচ্ছে? রাও উলটে প্রশ্ন করলেন।

'বোধ হয় কোনো সামুদ্রিক মহাসর্প' বলল অজয়।

'না'—ধমকে উঠলেন রাও। ওর মাথাটা দেখেছেন? ওর দেহের নিচ অংশটা লক্ষ করুন।

প্রাণীটি আরও খানিক ঠেলে উঠল জল থেকে। সত্যি ও মাথা সাপের হতে পারে না বরং কুমিরের বলা চলে। আর ওর সাপের মতো দেহের তলার দিকটা হঠাৎ চওড়া হয়ে গিয়েছে যেন একটা প্রকাণ্ড উল্টানো নৌকো ভাসছে জলে। মাঝে মাঝে সে দুলছে, হাঁ করছে। তীক্ষ্ণ ছুরির মতো দাঁতের সারি ঝকঝক করে উঠছে। মাথার নিচে শরীরের লম্বা অংশটা আসলে ওর বিষম লম্বা গলা।

'তবে কী ওটা? স্তম্ভিত অজয় জানতে চাইলে।

'আধুনিক কালের কোনো প্রাণী নয়। মনে হয় ডাইনোসর যুগের কোনো সামুদ্রিক সরীসৃপ, জবাব দিলেন রাও।

'ডাইনোসর!'অজয় অবাক হয়ে বলে। সে তো কোটি কোটি বছর আগেকার ব্যাপার। সে সময়ের প্রাণীরা তো এখন লুপ্ত।

'হু ঠিক,বললেন রাও, তাদের এখনও থাকার কথা নয়। তবু দু-এক রকম আদিম প্রাণী আশ্চর্যভাবে আজও আটকে আছে। যেমন, সীলাকাস্থ মাছ বা স্কটল্যান্ডের ল-নেসমনস্টার।

সহসা প্রাণীটা ডেকে উঠল। ট্রেনের হুইলের মতো তীক্ষ্ণ জোরালো সেই ডাক। একবার দু-বার তিনবার সে চিৎকার করে উঠল। সাগর আর হাওয়ার অট্টরোল ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠ। “নিঃসঙ্গ প্রাণীটা ডাকছে ওর সাথীকে। রাওয়ের কথা শোনা গেল।

সত্যি ওই প্রচণ্ড চিৎকারে যেন ক্রোধ নেই বরং এ যেন কাতর আর্ত আহ্বান। কয়েকবার চিৎকার দিয়ে প্রাণীটা আবার চুপ করে লাইট-হাউসের দিকে ফিরে স্থির হয়ে রইল।

‘আপনি ওটাকে আগে দেখেছেন? প্রশ্ন করল অজয়। দেখেছি,' বললেন রাও, ‘সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে এখানে আসে পূর্ণিমা রাতে। গত তিন বছর ধরে দেখছি।'

‘শুধু একটাই আসে?” “হ্যাঁ। হয়তো এই শেষ বংশধর। ওর জাতের আর কেউ আজ বেঁচে নেই।

এর কথা আপনি জানলেন কী করে? সুনীল জিজ্ঞেস করল।

রাও বললেন, ‘আপনাদের মতোই পূর্ণিমা রাতে জেলেদের মুখে প্রেতাত্মার কান্নার গল্প শুনে কৌতুহলী হয়ে এখানে আসি রাত কাটাতে, তখন দেখতে পাই।

‘আরে ওটা এত কাছে আসছে কেন। কী ব্যাপার! এত কাছে তো আসে না কখনও!' রাও বিচলিত স্বরে বলে উঠলেন।

অতিকায় রাজহাঁসের মতো গলা তুলে প্রাণীটা সরসর করে এগিয়ে আসতে লাগল কাছে। একেবারে লাইট হাউসের সামনে এসে থামল। তার শরীরটা স্পষ্ট দেখা গেল। গাঢ় সবুজ চকচকে দেহে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে। বিশাল চওড়া লেজটাকে সে ঝাপটাতে লাগল। তোলপাড় উঠল জলে। একবার সে ডেকে উঠল ভীষণ জোরে। কানে তালা ধরে গেল যেন। আবার সে নড়ে উঠল—এগোতে লাগল। তারপর মাথা নামাল। অজয়দের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

রাও বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলেন। একটু পরে চমকে উঠে বললেন—একি। এ যে দ্বীপে উঠে আসছে!’ বলতে বলতেই এক ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল।

এক অতি গুরু দেহ ভার। থরথর কেঁপে

লাইট-হাউসের ওপর হঠাৎ আছড়ে পড়ল এক অতি গুরু দেহ ভার। থরথর কেঁপে উঠল স্তম্ভটা। সঙ্গে সঙ্গে বাতিঘরের ঘাড়ের ওপর ঝুকে এল এক প্রকান্ড মাথা। নার্ভাস হয়ে টর্চের আলো ফেলল তার ওপর। এবং ফেলেই নিবিয়ে দিল সভয়ে। চকিত আলোক রশ্মির ঝলকে তিনজনে প্রত্যক্ষ করল এক ভয়ানক দৃশ্য — এক দানব মুণ্ড। অগ্নিগোলকের মতো তার দুই হিংস্র চক্ষু। ক্ষুধিত দাঁতের সারি। একবার দেখা দিয়েই সে সরে গেল, নামিয়ে নিল মাথা।

‘আসুন। কুইক। রাও লাফিয়ে উঠে উদভ্রান্তের মতো দৌড়ে গিয়ে নামতে লাগলেন নিচের ঘরে। অজয় আর সুনীলও অনুসরণ করল তাঁকে।

এরপর কিছুক্ষণের অভিজ্ঞতা অজয়দের জীবনে যেন এক দুঃস্বপ্ন। সেই বিরাট সরীসৃপ-দেহ বারবার আছড়ে পড়তে লাগল লাইট-হাউসের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার কি ক্রুদ্ধ ফেস-ফোসানি। অজয়দের ভয় হতে লাগল, এই সুদৃঢ় পাষাণ স্তম্ভও বুঝি ওর ধাক্কা। সইতে পারবে না। মাঝে মাঝে জানলার ফুটো দিয়ে নজরে আসছিল ওর বিরাট দেহের অংশ—কখনও তার ঘাড়, কখনও বা মাথার কিছুটা। ভাগ্যি ভালো জন্তুটা তাদের দেখতে পায়নি কারণ তার লক্ষ্য ছিল ওপরের বাতিঘর। | ছাদে অর্থাৎ বাতিঘরের মেঝেয় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল কী সব জিনিস। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন রাও-ও আজ ক্ষেপে গিয়েছে। লাইট-হাউসটাকে ও ভাবত ওর জাতের কেউ। বারবার এসে ডেকেছে তাহ। কিন্তু জড়স্তম্ভ সাড়া দেয়নি, ওর সাথী হয়নি। তাই আজ ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে, মারমুর্তি ধরেছে। এই অবাধ্য জীবটাকে শাস্তি দিতে চায়। জোর করে সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাবছে হয়তো।

মিনিট কুড়ি পরে এই তাণ্ডব হঠাৎ থেমে গেল। জন্তুটার আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন শুধু উত্তাল সাগরের মাতামাতি কানে আসে। লাইট হাউসের প্রহরীকক্ষে তিনটি মানুষে তখন প্রাণভয়ে ইষ্টনাম জপছে।

আরও বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তিনজন উঠে এল বাতিঘরে। দেখল, প্রাগৈতিহাসিক জীবটা অদৃশ্য হয়েছে, বাতিঘর তছনছ। মাত্র দুটি থাম আস্ত আছে। বাকিগুলো কোনোটা আধভাঙা, কোনোটা গোটাই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বড় বড় পাথরের খণ্ড ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। 'ভরা জ্যোৎস্নায় উদ্দাম দিকহারা সাগরের বুকে চেয়ে বিষন্ন সুরে বললেন রাও, ‘বোধহয় ও আর এখানে আসবে না। হয়তো ও বুঝেছে এ চেষ্টা নিষ্ফল। এ বস্তু তার সঙ্গী হতে পারবে না।

কথাটা সত্যি হয়েছিল। কলকাতায় ফিরে পরপর তিনবছর রাওকে চিঠি লিখে জেনেছিল অজয়—শরতের পূর্ণিমা রাতে রাওয়ের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপটি আর কখনও আসেনি লাইটহাউসের কাছে। বুঝি ওই নিঃসঙ্গ প্রাণী আজও সাত সমুদ্র চষে কেবলই খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার কোনো সাথীকে!